গানের মানুষ

সাত্যকি হালদার

আদিম মানুষের মতো জঙ্গল অথবা গুহার সন্ধানে।
বাঁকা চাঁদ মুচকি হেসে ঝাঁপ দিল মেঘের সাগরে।

আগের দিনে অনুষ্ঠান ছিল ছবিগঞ্জের কাছে। মাদারিপুর যাওয়ার বাস ধরে ছবিগঞ্জ। সেখানে ক'দিন আগে অতুল সাহার মা মারা গেছে। অতুল সাহা এখনও ছবিগঞ্জের বাজারে কাপড়ের বড় ব্যবসায়ী। হাটের দিন অনেক দূর-দূর থেকে খরিদ্দার আসে তার। মায়ের শ্রাদ্ধের পরের দিন সন্ধ্যেবেলা সে বাড়ির উঠোনে রামায়ণ গানের ব্যবস্থা করেছিল। সেই উপলক্ষ্যেই গানের দল এসেছিল পাতার হাট থেকে।

অতুল সাহার মস্ত উঠোন। উঠোনের সামনে দিয়ে গ্রামের ভিতরে যাওয়ার রাস্তা। উঠোনের ভিতর দিয়ে সাহার বাড়ি, অন্য দু'দিকে অন্য শরিকদের ঘর। এদের পরিবারের ও আত্মীয়স্বজনের বেশিরভাগই গত দশ-পনেরো বছর ধরে ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। অনেককে এদেশে ব্যবসা করে, আবার ইন্ডিয়াতেও পশ্চিমবঙ্গে কোথায়ও না কোথাও দোকানঘর বা জমি কিনে রেখেছে। কারও কারও অ্যাকাউন্টও রয়েছে ওদিকের কোনও ব্যাঙ্কে। রামায়ণ গান এবং তার আগে মা-র শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে অতুল সাহা ছবিগঞ্জ বাজারের প্রায় সবাইকেই বলেছিল। শ্রাদ্ধ হয়েছিল দুপুরবেলায়। সেই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া। বাজারের হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা, গ্রামের প্রায় প্রতি ঘরের লোক—প্রায় সবাই এসে খেয়ে গেছে। মা-র শ্রাদ্ধে সাহাবাবু মাথা গুণে বা লোক দেখে নেমন্তন্ন করেনি।

দেশভাগ বা তার পরে প্রায় বছর কুড়ি ধরে এ দেশের হিন্দুদের বেশিরভাগই যখন ইন্ডিয়ায় চলে গেছে ছবিগঞ্জের বাজারে তখনও বেশিরভাগ ছিল হিন্দুদের দোকান। কাপড়ের দোকান, কাঁসা-পিতলের দোকান, পাইকারি মুদিখানা। এছাড়া কুমার নদীর ধারে পরপর বেশ কয়েকটা পাটের গোডাউন। ছোট ব্যবসা, হাটের দিনে মাছ বা তরকারি, কিংবা খাসি-মুরগি বিক্রি—মুসলমানদের ব্যবসা বলতে ছিল এই রকম। কিন্তু বিরানব্বই সালে ভারতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও তারপরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মৌলবাদী শক্তির প্রবেশ, এই সব মিলে গত দশ-পনেরো বছরে ছবিগঞ্জের বাজারের চেহারা বদলে গেছে। হিন্দুদের বেশিরভাগই দোকান বিক্রি করে ধীরে এবং সপরিবারে মোট টাকাপয়সা সমেত ওদেশে চলে গেছে। মুসলমান পরিবার থেকে অনেকেই এসেছে বাজারে ব্যবসা করার জন্য। ছবিগঞ্জে কখনোই খুব বড় গোলমাল হয়নি। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসেছে, ব্যবসা করে গেছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর হঠাৎই একদিন দুপুরবেলা নদীর ওদিকের গ্রাম থেকে আসা কিছু লোক বাজারের মাঝখানে কালীবাড়িতে ভাঙচুর করতে এসেছিল। হাতে হাতে অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে এসেছিল তারা। হিন্দুরা চ্যাঁচামেচি শুনলেও সেদিনের সেই পরিস্থিতিতে এগোনোর সাহস পায়নি। তবে বাজারে চালের দোকানদার হুমায়ুন, খাসিকাটা বসির ও আরও কিছু লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে পালটা আক্রমণ করে গ্রামের সেই দলটাকে সহজেই হটিয়ে দেয়। কালীমন্দিরের দেওয়ালের সিঁড়িতে দু'একটা দাগ পড়ে, কিন্তু বড় রকম কোন ক্ষতি হয় না।

তবে এসব ঘটনার পর থেকেই হিন্দুরা একটু একটু করে সরে পড়তে থাকে। প্রতি বছরই দু-চারজন পাকাপাকিভাবে ইন্ডিয়ায় চলে যায়। যারা যায় তাদের যাওয়ার আগের দিনও পাশের দোকানদার বা প্রতিবেশীরা জানতে পারে না যে, তারা যে আত্মীয়র বিয়ে বা ডাক্তার দেখানোর কথা বলে ওদেশে যাচ্ছে, তা আসলে পাকাপাকিভাবে চলে যাওয়া। মালিক ফিরলেও বাড়ির লোকজন ফিরে আসবে না আর। ইন্ডিয়ায় থাকা-পরার ব্যবস্থা অনেক দিন ধরেই গোপনে তৈরি হয়েছিল। কিছুদিন পরে মালিক ফিরে এসে বাড়ির জমি, বাজারের দোকান এসব বিক্রির জন্য নানারকম চেষ্টা শুরু করে দেয়। অনেক সময় ভিতরে ভিতরে দালাল লাগিয়ে ব্যবস্থা করতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, ইন্ডিয়ায় চলে যাওয়া বা সেদেশে জমি-দোকান কেনার ব্যাপারে হিন্দুরাও এখন বিশ্বাস করে না হিন্দুদের। ওদেশে কীভাবে ভোটের লিস্টে নাম উঠে যাচ্ছে, পার্টি-সংগঠন ধরে রেশন কার্ড বেরিয়ে যাচ্ছে চটপট—এদেশে হিন্দুরা শরিক বা প্রতিবেশীর কাছে বেমালুম তা চেপে রেখে দেয়।

অতুল সাহার মায়ের শ্রাদ্ধে অনেক লোক হলেও রামায়ণ গান শোনার সন্ধ্যেবেলা অত লোক হল না। উঠোনের মাথায় চারপাশে দড়িবেঁধে চাঁদোয়া টানানো। উঠোনে এক পাশে ছেলেদের বসার ব্যবস্থা, অন্য পাশে মেয়েদের। সন্ধ্যের পর মেয়েদের জায়গাটা আশেপাশের হিন্দুবাড়ির মেয়ে-বউতে ভরে গেলেও ছেলেদের দিকটা খালি পড়ে থাকল অনেকক্ষণ। বাড়ির বাঁ পাশের বাড়ির দু-একটা বাচ্চা ছেলে ছেলেদের ফাঁকা জায়গায় হুটোপুটি করে যেতে লাগল। গান শরু হওয়ার কথা ছিল সন্ধে নাগাদ। কিন্তু সাজগোজ করে গাইয়েরা আসরে এল সাড়ে আটটারও পরে। তখন বাজার বন্ধ করে পুরুষমানুষেরা এক-দুজন করে আসতে শুরু করেছে। গাইয়েরা অনেকক্ষণ ধরে একতারা- দোতারায় টুংটাং করল, হারমোনিয়াম তবলায় মৃদু মেলামেলি চলল। সময় নিয়ে কারোই কোনও উদ্বেগ নেই। ন'টা নাগাদ অতুল সাহার বউ মাঝারি মাপের থালায় খানিকটা চাল, আলু, কাঁচকলা, সঙ্গে বাটিতে তেল-গোলা সিঁদুর আর ধূপকাঠি এনে আসরের সামনে রাখল। মেয়েরা সবাই হুলু দিয়ে উঠল শঙ্খ বাজাল, বেশিরভাগ বউরা গড় হয়ে কপাল মাটিতে ছুঁইয়ে প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপরই শুরু হয়ে গেল গান। ছেলেদের বসার জায়গায় তখন কয়েকজন মাত্র বসেছে।

পাতার হাট থেকে আসা এই দলে সব মিলিয়ে পাঁচ জন। বাঁশিতে হারমোনিয়ামে তবলায় একজন করে। মূল গানের দীনবন্ধু অধিকারী, সঙ্গে গলা মেলানোর জন্য আরও একটি লোক। মূলত দীনবন্ধু অধিকারী নামেই দলটি চলে। বাংলাদেশের সব জেলাতেই ছড়িয়ে রয়েছে হিন্দুরা। উত্তরে সিরাজগঞ্জ কুড়িগ্রাম থেকে শুরু করে দক্ষিণে ঝালোকাঠি পটুয়াখালি বরগুনা পর্যন্ত এই দলটির ডাক পড়ে। এদেশে রামায়ণ গান, কীর্তন বা ধয়ানি গানের দল এখন হাতে গোণা। আগে যেমন প্রতি গ্রামেই গানের দল থাকত এখন তা একেবারেই নেই। গ্রাম থেকে হিন্দুদের একটি-দুটি পরিবার চলে যাওয়ার ফলে সবখানেই দল ভেঙে যাচ্ছে। সমস্ত বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যায় এখনও বায়নার অভাব নেই। কিন্তু সেই বায়না মেটানোর মতো দলের বড়ই অভাব। দীনবন্ধু অধিকারীর দলের মতো একটি -দুটি দল সারা বাংলাদেশ ঘুরে এখনও গান শুনিয়ে বেড়াচ্ছে।

দীনবন্ধু অধিকারী লোকটির বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে। লম্বা দোহারা চেহারা, মাথার কালো চুল পেছন দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে গেছে। মুখে সামান্য পাউডার বুলিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সে যখন আসরের মাঝখানে উঠে দাঁড়ায় তখন তাকে দেখে চারপাশে আর কথা থাকে

না। সভা বন্দনা করে সে হাত জোড় করে নেচেনেচে এবং ঘুরেঘুরে সব দিকের লোককে নমস্কার করে। গানের সুর মিনতি করে সবাইকে জানায় যে আসরের গানে তার যদি কোনও ভূহত্রুটি ঘটে তাহলে যেন নিজগুণে সকলে তাকে ক্ষমা করে দেয়। তখন তার মুখে একটি করুণ ভাব এসে পড়ে। অতুল সাহার উঠোনে হ্যাজাকের আলোয় এই মানুষটির বন্দনা গান শুনে শুরুতেই সামনে বসা মেয়েদের মন ছলছল করে ওঠে। দীনবন্ধু অধিকারী তখন দোতারাটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে রামায়ণের একটি বা দুটি কান্ড ধরে তার গান শুরু করে দেয়।

সব দলের মতো এই দলেরও বন্দনা গানের অংশটি একেবারেই নিজেদের। এই গানের রচয়িতা পাতার হাটের বিখ্যাত গাইয়ে হিমাংশু অধিকারী। গানের সুর প্রচলিত এবং কোথাও কোথাও হিমাংশু অধিকারীর নিজস্ব। প্রায় কুড়ি বছর আগে মরে যাওয়া সেই লোকটি দীনবন্ধু অধিকারীর বাবা, এক সময় সারা ফরিদপুর জুড়ে সেই লোকটিও দল নিয়ে গান গেয়ে বেড়াত। তারপর গানের আসরে ভেসে যেত এক সময়। একাত্তর সালে খান-সেনা আর রাজাকারদের অত্যাচারে হিন্দুরা পালিয়েছিল। দীনবন্ধুর তখন বছর দশ-বারো বয়স, তার নীচে ছোট একটি বোন। বনগাঁ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে টানা তিনরাত থাকার সময় সেই ছোট্ট মেয়েটি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। কোনও রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়নি গান ছাড়া বিধ্বস্ত হিমাংশু অধিকারী চোখের সামনে মেয়েটিকে ঢলে পড়তে দেখার পর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। উন্মাদের মতো একটি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে সারা বনগাঁ শহর ও তার অলিতে-গলিতে ঘুরত। কখনও চলে যেত ইচ্ছামতীর ধরে খয়রামারি শ্মশানে, যেখানে নিজর হাতে সে সাত বছরের মেয়ের মুখাগ্নি করেছিল। সেই সময় দীনবন্ধু বা তার মা—কারও সঙ্গেই প্রায় সম্পর্ক ছিল না লোকটির।

তবে মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলে হাতে গোনা যে হিন্দু পরিবারগুলো ফিরে আসে, তার মধ্যে পাতার হাটের এই অধিকারীরাও রয়েছে। খানিকটা শান্ত, তবে একেবারেই চুপচাপ হয়ে যাওয়া হিমাংশু অধিকারী ভিখারির মতো ছেলে ও বউয়ের হাত ধরে গ্রামে ফেরে। প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাওয়া সেই গ্রামে ঘর মেরামত করে আবার থাকা শুরু হয়। আশেপাশের গ্রামে আরও কিছু হিন্দুরা ফেরে। কাছাকাছি মুসলমান প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে সাহস জোগায়। অন্যভাবে জীবনযাপন শুরু হয় আবার।

তবে হিমাংশু অধিকারী তারপর থেকে গান গায়নি আর। সারাদিন বাড়িতে বসে থেকেছে। ফিরে আসা পরিবার যেতে দু-একজন বন্ধু জোগাড় করে সেই কম বয়সে দীনবন্ধুই নতুন দল গড়েছে। তখন। অল্পস্বল্প রিহার্সাল করেছে। বাপের পরিচিতিতে একসময় ডাক আসতে শুরু করেছে তার। সেই থেকে দীনবন্ধু অধিকারী বাপের ঢঙে এবং বাপেরই কথায় বন্দনা গান গেয়ে চলেছে।

অতুল সাহার উঠোনে বন্দনা গান শেষ হলে সেদিন রামায়ণের উত্তরকান্ড থেকে গান শুরু হয়। উত্তরকান্ড যা রামায়ণের একেবারে শেষ অংশ, যেখানে বাল্মীকির আশ্রমে সীতার নির্বাসন ও শেষে অগ্নিপরীক্ষার কথা আছে। যেখানে বাড়ির কেউ মারা গেলে তার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পর রামায়ণের জন্য ডাক পড়ে, সেখানেই দীনবন্ধু রামায়ণের এই শেষ অংশটুকু গেয়ে থাকে। আসর অনুযায়ী এই গান নির্বাচন— তার বাবারই আরেক শিক্ষা। উত্তরকান্ডের রামায়ণে লঙ্কাজয় ও সীতা লাভের পরও শুধুই বিষাদ আর বিচ্ছেদ। সীতার বিচ্ছেদ, লক্ষণের বিচ্ছেদ এবং সব শেষে ক্লান্ত বিধ্বস্ত রামচন্দ্রের সরযূ নদীতে প্রাণ বিসর্জন। মৃত্যু যে বাড়িতে মাত্র কয়েকদিন আগে ছুঁয়ে গেছে, যেখানে পরিজনরা এখনও ঘরের লোকটিকে প্রতিদিনের কাজে ভুলতে শুরু করেনি, যেখানে শোকের ছায়া জ্যোৎস্নায় বটের ছায়ার মতো গভীর—সেখানে উত্তরকান্ডের রামায়ণ গান সবাইকেই আকুল করে তোলে। দীনবন্ধু অধিকারী জানে ঘন্টাখানেক গানের পরই সম্পূর্ণ আসরটিই তার কথায় ও সুরে প্লাবিত হয়ে যাবে। মেয়েরা প্রথমে আঁচলে চোখ মোছে, পরে নিজেদের মধ্যে কাঁদতে শুরু করে দেয়। হ্যাজাকের আলোর পাশে বসা ছেলেরাও ব্যাকুল হয়ে ওঠে এই সময়। কুমার দীর ধারে ছবিগঞ্জের গ্রাম থেকে মেঘনা পায়রা কি সন্ধ্যানদীর ধারেও এগোন, দীনবন্ধ অধিকারী এই উত্তরকান্ড একইভাবে আসরের মানুষদের কোথায় কোন অজানা রাতে হারিয়ে নিয়ে যায়।

রাত সাড়ে দশটা নাগাত হাজি আকমল সাহেব আসেন। কাছের চরমুগরিয়া মার্চেন্টস হাইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছিলেন। বছর সাত-আট হল রিটায়ার করেছেন। রিটায়ার করার পর পি-এফ গ্রাচুইটির টাকায় হজ করে এসেছেন। ছবিগঞ্জ বাজারে তার মেজোছেলের পাটের দোকান। সন্ধ্যের পর থেকে তিনি ছেলের দোকানেই বসেন। চেনাজানা দু'একটা পুরানো লোক হাটে এলে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব হয়। সাড়ে দশটা নাগাদ বাজার ফেরত পথে তিনি রামায়ণের আসরে এসে হাজির। তাকে দেখেই পিছন দিকে দু/একজনের সঙ্গে বসা-মাথা ন্যাড়া দাড়ি-গোঁফ কামানো অতুল সাহা উঠে দাঁড়ায়। চেয়ারখানা টেনে আকমল সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে— বসেন স্যার, বসেন। আপনে মোর বাড়ি গান শুইনবার আসবেন এইডা ভারতেও পারি নাই...।

সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ছাঁটা গোঁফ বড় সাদা দাড়ির হাজিসাহেব শুকনো হেসে বলেন—শরীরডা খারাপ কয়দিন। সন্ধ্যার পর বেশি সময় আর বাজারে থাকবার পারি না। তবু দীনবন্ধুর নাম শুইন্যা আসা। নিতাই পোদ্দার গত বচ্ছর যহন আশ্বিন মাসে গান দিছিল, এই লোকডাই আইছিল না? পাতার হাত্তের দীনবন্ধু শুইন্যাই মনের ভিতর ফির টান দিল।

হাজি আকমল সাহেব বসে পড়েন। তার পাশাপাশি চেয়ারে বাজারের আরও দু'একজন। হাজি সাহেবকে দেখে সবাই এক-দুবার ঘাড় ঝোঁকায়। যার কথা হচ্ছিল সেই নিতাই পোদ্দার মাথার ওপর হাত তুলে নমস্কার জানায়। হাজি সাহেবের পাশেই সবুজ প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে ছিল আগের বারের মেম্বার জোহোর আলি। তার মাঝবয়সি চেহারা, মাথায় টাক, গালে কালো দাড়ি। পান খাওয়া দাঁত বার করে হাজিসাহেব গলার কাছে মুখ নামিয়ে বলে— আগে এইসব কাম না-জায়জ ভাইবতাম। ইন্দু গো এইসবের ধার দিয়াও যাই নাই। অ্যাহন অইন্যরকম ভাবি। নাই নাই কইরাও ইন্দু মাইনষের ভোটে তো কম নাই। সব কয়ডা ভোট আওয়ামি লিগরে নিতে দিমু ক্যান!

অল্প সময় বসলেও আকমল সাহেবের মন গানে চলে গেছে। দীনবন্ধু তখন অযোধ্যায় ফেরা লব-কুশকে রামচন্দ্রের না চিনতে পারার কথা বলছে। সে এক আশ্চর্য করুণ আবহ। প্রজাপালক মহান রামচন্দ্র চিনতে পারছে না নিজের ছেলেদের। দুই কুমার বালক রাজসভায় দাঁড়িয়ে আছে ম্লান মুখে। আকমল সাহেব তার ঘাড়ের কাছে ফিসফিস করে কথা বলা জোহোর আলিকে একেবার দেখলেন। একটিও কথা বললেন না। দীনবন্ধু তখন হারমোনিয়াম ও দোতারার মৃদু সংগতে লব-কুশের আর্জির কথা শোনাচ্ছে। বাবাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে তাদের দুঃখিনী মায়ের নির্বাসিত হয়ে তপোবনে বাস করার কথা। বাল্মীকির শেখানো নিজের

জীবনের গান শুনেও রামচন্দ্র তা বুঝতে পারছেন না। আকমল সাহেব কোনও কথা না বলায় দাঁত বের করা জোহোর আবার গলা নামিয়ে বলে— আপনে হজ করা মানুষ। ইন্দুগো এই সব বিলিকছিলিক কীত্তন শোনলে এছলামে গুণা হয় না?

হাজি সাহেব বা জোহোর ছাড়াও সভায় গান শুনতে আসা মুসলমানের সংখ্যা কম নয়। তারা অনেক আগে এসেছে এবং সামনের দিকে মাটিতে পাতা সতরঞ্চিতে গ্রামের অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। অনেক আগে থেকে উত্তরকাণ্ডের গান শুনতে থাকায় তারা সম্পূর্ণই অভিভূত। কোথাও কোনও দিকে মন নেই। অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে দীনবন্ধু অধিকারীর হাত নেড়ে গেয়ে যাওয়া করুণ সুরের দিকে। এই সময় পিছন দিকে একটা মৃদু গুঞ্জন ওঠে। সকলেই যে তা বুঝতে পারে এমন নয়। পিছনে দাঁড়ানো অতুল সাহা হঠাৎ দেখে অনেকখানি বয়স হয়ে যাওয়া আকমল সাহেব তড়াক করে দাঁড়িয়ে জোহোরের ঘাড় চেপে ধরেছেন। তারপর চিড়বিড় করে বলছেন—হালার পো হালা, তুই হজুর হইছিস নাকি! দুই দিনের মেম্বার, হালা তুই এছলামের বোঝোস কী!

পিছন দিকে বসা কয়েকজন আরও উঠে দাঁড়ায়। আকমল সাহেব হজ করে আসা মানুষ। দীর্ঘদিন মাস্টারি করায় যথেষ্ট সুনাম তার এলাকায়। তুলনায় জোহোর আলি লোকটিকেও সবাই হাড়ে হাড়ে চেনে। মাঝখানে ক'বছরের জন্য মেম্বার হয়েছিল সে। এখন হিন্দুবাড়িতে গান শুনতে এলেও তার কীর্তিকাণ্ড আনেকের জানা। রাতে রাতে হিন্দুবাড়ির টিনের চালে পাথর ছোড়া, ঘরে দুই বউ থাকতেও গঞ্জের ইস্কুল ফেরত মেয়েদের খারাপ ইশারায় ডাকা— মেম্বার হওয়ার আগে এসব সে করেচে। বাজারের কালীমন্দিরে আক্রমণ হয় যেবার, সে নাকি তখন দূরের গ্রামের লোকদের গোপনে ডেকে এনেছিল। পরে সে আসরে এসে বসলেও হিন্দু-মুসলমান কেউই তাকে সুবিধার চোখে দেখেনি। ইদানীং তার মেম্বারি চলে যাওয়ার ফলে কেউ তাকে আর অতখানি পাত্তাও দেয় না। আকমল সাহেবের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল তৈবর নামের একজন। মাঝবয়সি সে লোকটারও গানের দিকে মন ছিল এতক্ষণ। তবে আকমল সাহেব ও জোহোরের কথা কাটাকাটি সে শুনেছে। গানের মাঝে হৈচৈ-এ বিরক্ত হচ্ছিল। আকমল সাহেবের কথার পর জোহোর আরও কিছু বলতে গেলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জোহোরকে বলে— হালা ইবলিশ, তুই গানমান শোনাতে আইস ক্যান! দুই হান বিয়া করছিস, ঘরে বইস্যা ঠাপাঠাপি কর। তুই গান শুইনবার আইলে ইন্দুগোরও খারাপ, এছলামেরও গুনা। তরে আসতে কয় কোন সুমুন্দি...!

অতুল সাহা অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই মিটিয়ে দিতে চায়, তার এক হাতে আকমল সাহেবের হাত ধরা। অন্য হাত তুলে তৈবরকে থামায়। জোহোর আলিকে অবশ্য তার দিক থেকে কিছু বলা হয় না। শত হলেও তার মায়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রামায়ণ গানের আসরে লোকটি নিজে থেকে এসে বসেছে। জোহোরের উদ্দেশ্য কখনোই খুব সুবিধার নয়। তবু গৃহকর্তা তো তাকে চলে যেতে বলতে পারে না। তাছাড়া এসব ইসলাম - অইসলাম ব্যাপারে নাক গলানোও এদেশে হিন্দুদের পক্ষে একান্ত অনুচিত। তাই অতুল সাহা জোহোরকে দেখেও দেখে না। কিন্তু আকমল সাহেবের ধমক আর তৈবর ও অন্যান্যদের কটুক্তিতে জোহোর আলি আর বসে থাকতে পারে না। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পিছন দিক থেকে গুটিগুটি বাড়ি চলে যায়।

ব্যাপার না বুঝলেও পিছনের নড়াচড়া দীনবন্ধু অধিকারীর চোখে পড়েছিল। তার গানে তখন সদ্য সীতার পাতাল প্রবেশ হয়েছে। সিংহাসনের রামচন্দ্র অধীর। সামনের সতরঞ্চিত বসা শ্রোতারাও মুহ্যমান। অনেকেই ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হারমোনিয়াম আর দোতারা বেজে চলেছে করুণ সুরে। দীনবন্ধু অধিকারী মুহূর্তের জন্য গান বন্ধ করে পিছনের গোলমানের কারণ জানতে চায়। তার গানে কারও কোনও অস্বস্তি বা ভালো না-লাগা লহ কিনা। গান কি আপাতত বন্ধ রাখা হবে! তখন পিছন থেকে তৈবর গলা তুলে বলে— কিছু না কিছু না, এদিকে কোনও কিছু অয় নাই। আপনে গান চালায় যান।

আবার গান শুরু হয়। আবার দোতারা বাজে। হারমোনিয়ামে প্রাচীন কোনও দেশি সুর বেজে ওঠে।

অতুল সাহার মায়ের অনেকটাই বয়স হয়েছিল। তবু সেই বুড়ি হেঁটে চলে বেড়াত। আশেপাশের বাড়িতে বা কাছাকাছি নদীর ঘাটে যেত কখনও। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক-এক প্রতিবেশীর বাড়িতে এক-এক বিকেলে চলে যেত। সন্ধের মুখে গল্পের আসর বসে যেত সেখানে। অনেকখানি বয়স হয়ে মারা গেলেও সারা গ্রামে সবাই ভালোবাসত তাকে। ঠাকুমা দিদিমা বলে ডাকত। তাকে শ্মশানে নেওয়া হলে কুমার দীর ধারে গ্রামের পুরনো শ্মশান ঘাট অনেক মানুষে ভরে উঠেছিল।

দীনবন্ধু অধিকারীর গনে সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণের রামচন্দ্রকে ছেড়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া এবং সিংহাসনে একা বিমর্ষ রামচন্দ্র—এই মৃত্যু ও নিঃসঙ্গতা যেন গ্রামে মাত্র ক'দিন আগে মারা যাওয়া এক বুড়িকেও মনে করায়। যার শ্রাদ্ধের পরবর্তীতে এই রামায়ণ গান। এই রাতে রামায়ণ গানের নৈবেদ্যে তার আত্মা যেন মুক্তি পেয়ে যায়। সকলের থেকে এই রাতের গানের পর যেন আরও দূরে চলে যাবে সে। রামায়ণের শেষ দিকে সেই বিদায়ের প্রস্তুতি। নির্বাক হয়ে বসে থাকা প্রতিটি মুখ যেন নিকট বা দূর অতীতে নিজস্ব কোনও প্রিয়জনের জন্য কষ্ট পায়। মনের ভিতর শোক জেগে ওঠে। তৈববের মনে পড়ে মাত্র ক'মাস আগে তারও তো আব্বাজান মাটির আড়ালে চলে গেছে। রামায়ণ গানে যে বিষাদের সূর তা কি তার আব্বার জন্যও নয়!

সরযু নদীতে রামচন্দ্রের প্রাণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে গান শেষ হয়। রাত তখন বারোটার কাছে। গানের শেষে সকলেই নির্বাক। দীনবন্ধু অধিকারী কথা আর গানের মানুষ ভোলাতে ভোলাতে নিজেও কেঁদে ফেলে শেষ সময়। তার গলা ভারী হয়ে যায়। হারমোনিয়াম দোতারা থামলে সে মাথা নিচু করে সভায় সব দিকে নমস্কার জানায়।

সেদিন আকমল সাহেবেরও গলা ধরে এসেছিল। আরও কিছুক্ষণ বসে তিনি চেয়ার থেকে ওঠেন। তখন সহকারীদের সঙ্গে বিভিন্ন যন্ত্র গুছিয়ে তুলতে থাকা দীনবন্ধুকে ডাক দিয়ে বলেন— আপনার গান এইহানেই শেষ না। কাইলও বায়না আছে একখান। কাইল আমার বাড়িতে এই পালাই গাইতে হইবে...।

দীনবন্ধু আবারও হাত জোড় করে এবার আকমল সাহেবের দিকে। তখন অন্যরাও তাকে দেখছে। দীনবন্ধু জড়ানো গলায় বলে— এইডা নিয়ে কিছু মনে করবেন না আপনেরা। আইজই ছিল দ্যাশের মাটিতে মোর শেষ আসর। বাড়ির হগলডিরে নিয়া কাইলই আমি ইন্ডিয়ায় যাইতাছি। মনে হয় আর ফেরবার পারমু না।

গানের শেষে আকমল সাহেবের কথায় অধিকারীর এই বঞ্চিত উত্তরে সবাই অবাক হয়ে যায়। ইন্ডিয়ায় যায় অনেকে, বাড়ির সবাইকে নিয়ে চলে যায়—কিন্তু যাওয়ার দিন পর্যন্ত এই কথা চাপাই পড়ে থাকে। কাছের প্রতিবেশীও সামান্য টের পায় না। সেখানে

দীনবন্ধু অধিকারী সভায় দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার কথা বলছে। তার কোনও রাখঢাক নেই। ঘরে পিঠেপিঠি দুই মেয়ে বড় হচ্ছে তার। হয়তো তাদের বিয়ের ভাবনাতেই আরেকটি পরিবারে বাংলাদেশে ছেড়ে পাকাপাকি ইন্ডিয়ায় চলে যাবে।

হাজি আকমল সাহেবও চেয়ার থেকে উঠে কেমন বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বলেন—আপনার দলের কী হইব তয়! কেউ বা মোদের গান শুনাই ভুলায় রাখব!

গানের শেষে খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা। অনেকেই আসরের এক পাশে মাঝরাতে খেতে বসে গেছে। গানের দলের লোকেরা গোছগাছে ব্যস্ত। দীনবন্ধু অধিকারী কাঁদতে কাঁদতেই ভাঙা আসরে কথা বলে যায়। —দলের কী হইব আমি জানি না। এরা যদি পারে তো কিছু করব। তয় এরাও কেউ কেউ মনে মনে ইন্ডিয়ায় যাওয়ার কথা ভাবে।... কিন্তু মোর ওইদিকে একখান ব্যবস্থা হইছে। তাছাড়া বড় মাইয়াডারও একখান সন্ধান চলতাছে...।

অতুল সাহা খাওয়ার তদারকিতে চলে গেছে। প্রথম দিকে মেয়েরা বাচ্চারাই খাচ্ছে। ছেলেরা দু'একজন দূরে দূরে বসেছে। কিন্তু অনেকেই দীনবন্ধু অধিকারী, আকমল সাহেব, গানের দল—এদের চারপাশে ছড়ানো। নানা কথার মাঝে তৈবর হঠাৎ বলে— কিন্তু ইন্ডিয়ায় তো যাইতাছেন। আপনারে বা বাড়ির হগলের খাওনপরন চলব কী ভাবে! গান তো ওইদিকে হইব না...।

অধিকারী হাত জোড় করে বলে—তার ব্যবস্থাও দয়ালঠাকুর একটু রাখছেন। তেহট্টের ওই দিকে মোর দুই শালায় থাকে। হেয়ারা আমার জইন্য একখান পুরানো ভ্যান দেইখ্যা রাখছে। আপাতত ওইডা নিয়া ভাড়া খাইটে শুরু করুম।

—আপনে পারবেন?

—ব্যাঁইচ্যা থাকার জন্যই মানুষে কী না পারে।

হ্যাজাকের আলো আরও খানিকটা কমে যায়। আগে দুতিনবার পাম্প করা হয়েছে। কিন্তু এই শেষ আসরে দীনবন্ধু অধিকারীর কথার পর আলো বাড়িয়ে তোলায় কারও যেন আর উৎসাহ থাকে না। দূরে কয়েকজন আবছায়ার মধ্যে বসে খিচুড়ি আর তরকারি মেখে খায়। অতুল সাহা ঘোরাঘুরি করে। তার মায়ের যে ছবিটি গলায় একটি রোগাটে মালা পরিয়ে টুলের ওপর রাখা ছিল সেটি নিঃসঙ্গে পড়ে থাকে। তৈবর ও আরও কয়েকজন মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আকমল সাহেব দুদিকে বারবার মাথা নাড়েন।

তারপর রাত আরেকটু বাড়লে সকলেই বাড়ির দিকে যায়। গানের দলের সেই রাতে অতুল সাহার বারান্দায় থাকার অবস্থা। সেই মতো চাদর পাতা হয়েছে। রাতে গ্রাম ও গঞ্জের রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। কুমার নদীর পাড়ে বাঁশবন, গোলপাতার ঝড়া। অন্ধকারে সেসব দিকে শেয়াল ডাকে। ঠান্ডা বাতাস বয় কখনও। বাজারের পাহারাদার মাথা-পাগল নড়ু মিঞা অনেক দূরে ফুকফুক করে বাঁশি বাজায়।

অন্ধকারে পথ চলতে চলতে অনেকের মনে তখনও রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের গান ভাসে, কথা আসে। সেই সঙ্গে মনে হয় বাবরি চুলের সেই গায়কের কথাও। আর ক'দিন পর মফস্সলের কোনও রেলস্টেশান বা জাবারের ধারে ফাঁকা ভ্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সে। সেখানে অনেক লোকের যাতায়াত, অনেকেই ব্যস্ত। একটি দুটি প্যাসেঞ্জারের আশায় ভ্যানওয়ালা হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকবে সেই চলমান জনতার মুখে।